পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর দ্রুতপাঠ্য কবিতা-পুস্তকরূপে অনুমোদিত।
বিজ্ঞপ্তি নং সিল্ ৭৪।৫৪ তাং ২১।১২।৫৪
কলিকাতা গেজেট ৬।১।৫৫ দ্রষ্টব্য।

কাব্য-মঞ্জুষা

(৭ম শ্রেণীর জন্য)

মোহিতলাল মজুমদার

দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—
শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য—সাত আনা মাত্র

মুদ্রাকর :—শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দেশবাণী মুদ্রণিকা
১৪, ডি. এল্. রায় স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচী

পুরাতন যুগ

পরিবর্ত্তন-যুগ

আধুনিক যুগ

পরিশিষ্ট

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-)—১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ, নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত। করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শব্দ-চয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির নাম—'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধান-দূর্ব্বা'। [২১]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-)—কবির জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অতি অল্পবয়সে, তিনি 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' নামক বাঙালী পল্টনে যোগদান করিয়া মেসোপটেমিয়া যাত্রা করেন, এবং 'হাবিলদার'-পদ লাভ করেন। যুদ্ধশেষে দেশে ফিরিয়া তিনি 'মোস্‌লেম ভারত' নামক একখানি নূতন সাহিত্য-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই কবিতাগুলির আশ্চর্য্য ছন্দো-নৈপুণ্য ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং ক্রমে তিনি একজন অসাধারণ কবি-বালকরূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন—তেমন খ্যাতি ইদানীং আর কোনও কবি লাভ করেন নাই। কবি নজরুলের বহু কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধু-হিল্লোল', 'ছায়ানট', 'বুলবুল'। [২৬]

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)—বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও সেসন্স জজ কেদারনাথ রায়ের পত্নী। বাংলার মহিলা-কবিগণের মধ্যে ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অপরগুলির নাম—'নির্ম্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি।

[১৫, ১৬]

কালিদাস রায় [কবিশেখর] (১৮৮৯-)—১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসে, রাঢ়ীয় বৈদ্যবংশে, বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুর ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। ইনি 'কুন্দ', 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'ঋতুমঙ্গল', 'রসকদম্ব', 'বৈকালী' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। [২৫]

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-)—বর্দ্ধমান জেলার 'উজানী' গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম হয়। ইনি দীর্ঘকাল মাথরুণ (বর্দ্ধমান জেলা) উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কবি-হিসাবে ইহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বলা যাইতে পারে—ইঁহার প্রাণ-মন সেই প্রেম ও ভক্তিরসে পূর্ণ। ইনি 'অজয়', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন ; কাব্যগুলির নামেও তাঁহার বিশিষ্ট কবি-ভাবের পরিচয় রহিয়াছে। [২৪]

কৃত্তিবাস ওঝা (খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী)—জন্ম-তারিখ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষে জন্মগ্রহণ করেন। মুখুটি-বংশীয় ব্রাহ্মণ—উপাধি ওঝা, অর্থাৎ উপাধ্যায়। অনেকের মতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর দনুজমর্দ্দন গণেশের আদেশক্রমে তাঁহার অমর কীর্ত্তি 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন। এই 'রামায়ণে'র ভাষার বহু পরিবর্ত্তন হইয়া এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে কৃত্তিবাসের নিজের ভাষা কতখানি আছে বলা কঠিন। তথাপি ইহাই কৃত্তিবাসের কবিত্বের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। [২]

জসীম উদ্দীন (১৯০·· —কবি লিখিয়াছেন—তাঁহার "জন্মস্থান তাম্বুলখানা—ফরিদপুর শহর হইতে ১৬ মাইল দূরে একখানা বুনো

জঙ্গলপূর্ণ গ্রাম।" পৈতৃক বাসস্থান উক্ত জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম। তিনি বাংলার পল্লী-জীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সহিত মনে-প্রাণে এমন ভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে, উচ্চশিক্ষা (এম-এ ডিগ্রী) লাভ করিয়া, অথবা বিদ্বান সমাজে বাস করিয়াও (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে) তিনি তাঁহার সেই আজন্ম পল্লী-প্রেম এবং পল্লী-জীবনের সংস্কার কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এ পর্য্যন্ত কবি এই কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন—'রাখালী', 'বালুচর', 'ধানখেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। তাঁহার 'নক্সী কাঁথার মাঠ'-এর—"The Field of the Embroidered Quilt" নামে ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। [২৭]

জ্ঞানদাস (ষোড়শ শতাব্দী)—শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের অন্যতম। প্রাচীন বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া (কন্দুরা) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'ব্রজবুলি' ভাষায় বহু পদ রচনা করিলেও, ইঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। এই পদগুলির গভীর আন্তরিকতা, ভাবের স্বাভাবিকতা এবং ভাষার গাঢ় অথচ সহজ ভঙ্গির গুণে ইনি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। [৩]

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)—বাংলা ১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম হয়। ১২৬৮ সালে বি-এ পাস করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। নবীনচন্দ্র নূতন যুগের মহাকবিগণের অন্যতম। তাঁহার কবিতায় ভাব ও ভাবুকতার একটা গম্ভীর ও উন্নত আদর্শ-রক্ষার প্রয়াস আছে। তাঁহার কল্পনাশক্তি—বিশেষতঃ গল্প-রচনার শক্তি—কিছু অবাধ ও স্বাধীন ছিল, এবং ভাবের উচ্ছ্বাসেও একটু বাড়াবাড়ি ছিল ; তথাপি তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, এবং ছন্দও মধুর-গম্ভীর। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে 'পলাশির যুদ্ধ' একটি উৎকৃষ্ট রচনা ; ইহার

মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীর কন্যা। ১৪ বৎসর বয়সে রচিত তাঁহার একটি কবিতা তখনকার বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাঁহার প্রথম পুস্তক 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' ১৩০০ সালে প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতেই তিনি কবি-খ্যাতি লাভ করেন। পরে 'কনকাঞ্জলি' ও 'বীরকুমার-বধ' নামে আরো দুইখানি কাব্য রচনা করেন। [২০]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)—নদীয়া জেলার জমশের-পুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী পরিবারে, সন ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺হরিমোহন বাগচী। তিনি অধুনালুপ্ত 'মানসী' ও 'যমুনা'—দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান— 'রেখা', 'লেখা', 'অপরাজিতা'. 'জাগরণী', 'নাগকেশর', 'নীহারিকা', 'মহাভারতী' ও 'পাঞ্চজন্য'। [২২]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭)—হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল অতিশয় সুপণ্ডিত ছিলেন—অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। তাঁহার অন্যান্য কয়েকখানি কাব্যের নাম—'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী-কাবেরী'। [৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্ম হয়; পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। ১৭ বৎসর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য প্রথম বিলাতযাত্রা করেন। সেই সময় হইতে 'ভারতী' পত্রিকায় বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর সারাজীবন ধরিয়া ক্রমাগত কাব্য, নাটক, নভেল, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৯১ সালে বিখ্যাত মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশ করেন। ১৯০০-১৯০১ সালে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক হন। ১৯০২ সালে স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ১৯১২ সালে কবির বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' এক বিরাট সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং এই বৎসর তিনি তৃতীয় বার ইউরোপ-ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯১৩ সালে নোবেল-প্রাইজ পান। ১৯১৫ সালে নাইট-পদবী লাভ করেন। ১৯১৯ সালে 'জালিয়ান-ওয়ালাবাগে'র প্রতিবাদস্বরূপ 'সার্' উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে সমগ্র ইউরোপ পর্য্যটন করেন এবং সর্ব্বত্র অসাধারণ সম্মান লাভ করেন। ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী' ও পরবৎসর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে একাদশতম বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন, ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যটন করিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে কোন কোন দেশে একাধিকবার গমন করেন। ১৯৩১ সালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হইলে পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ তাঁহাকে আনন্দ ও সম্মান জ্ঞাপন করেন, এবং সেই উপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী-উৎসব হয়; সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষৎ তাঁহাকে 'কবি-সার্ব্বভৌম' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯৩২ সালে তিনি পারস্যের সম্রাটের নিমন্ত্রণে আকাশযানে পারস্যে গিয়াছিলেন।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে কবি পরলোক-গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ভারতের মহাকবিগণের অন্যতম। বাল্মীকি, ব্যাস এবং কালিদাসকে বাদ দিলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যেও চতুর্থ আর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন; এমনও বলা যাইতে পারে যে, গীতিকবি হিসাবে তিনি এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির শীর্ষস্থানীয়। আরও একটি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা অনন্য-সাধারণ—তিনি ভারতের সর্ব্বযুগের সাধনাকে কাব্যের ভিতর দিয়া এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং সেই সাধনায় মানবাত্মার যে অত্যুচ্চ ধারণা নিহিত ছিল, তাহারই প্রেরণায় তিনি আধুনিক যুগে, সর্ব্বজাতির—সর্ব্বমানবের—মহামিলন-গান গাহিয়াছেন। এজন্য তাঁহার রচনাবলীতে বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় ভাব-চিন্তার যাহা-কিছু সত্য, সুন্দর ও সঞ্জীবন তাহাকেও তিনি খাঁটি ভারতীয় ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট মিলনভূমি হইয়া আছে।

কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তিনি বাংলা-ভাষা ও বাংলা-ছন্দকে এত রূপে এত ভঙ্গিতে কর্ষণ করিয়াছেন যে, তাঁহার হাতে বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের সকল দৈন্য ঘুচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব; তাঁহার রচিত প্রধান কাব্যগুলির নাম 'সঞ্চয়িতা' অথবা 'চয়নিকা'র সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য।

[১৮, ১৯]

রামনিধি গুপ্ত (১৬৬৩-১৭৫৬)—রামনিধি গুপ্ত বা নিধিরাম গুপ্ত হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত গানগুলি 'নিধুবাবুর

টপ্পা' নামে বিখ্যাত। এককালে নিধুবাবুর টপ্পা লোকের মুখে মুখে সব সময়েই শোনা যাইত। [৬]

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)—ব্রাহ্মণ-জমিদার বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়; হুগলী জেলার (পূর্ব্বে বর্দ্ধমান) অন্তর্গত হাওড়ার অদূরবর্ত্তী আমতার নিকট ভুরশুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো গ্রামে জন্ম হয়। ভারতচন্দ্র পরে নিজ পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। অতঃপর উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [৫]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১২৮৮-১৩২৯)—ইনি বিখ্যাত গদ্য-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র—পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের অন্যতম হইলেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। খাটি বাংলা-ভাষা ও বাংলা-ছন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; এই দুই বিষয়ে তিনি অসামান্য রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'তীর্থ-সলিল', 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর', 'মণিমঞ্জুষা', 'বিদায়-আরতি' ও 'বেলাশেষের গান'। [২৩]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭-১৮৭৮)—যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী জগন্নাথপুর ইঁহার জন্মভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে ইহার জন্ম হয়। ইনি বাংলা কাব্যের নবযুগের কবিগণের অন্যতম। 'মহিলা কাব্য'ই ইঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। [১১]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)—বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগে যে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল কবি হেমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। হুগলী জেলায় রাজবলহাট নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার রচিত 'বৃত্রসংহার কাব্য' বিখ্যাত মহাকাব্য। 'চিন্তা-তরঙ্গিণী', 'বীরবাহু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। কবি শেষ বয়সে অন্ধদশায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। [১২, ১৩]

পুরাতন যুগ

১

কৃতাঞ্জলি

মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভবতারণ-ভার তোহারা॥

—বিদ্যাপতি

সীতার বিবাহ

গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥
হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী॥
চিরুণীতে কেশ আচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর।
বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর॥
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি॥
উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥

দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ॥
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তার বাজন-নূপুর॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি॥
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাত বার করিল রামেরে॥
অবগুণ্ঠন ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে॥
হস্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
হস্তে ধরি তোল সীতা বলে বন্ধুজন॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হস্তে ধর কেহ বলে পায়ে॥
পূর্ব্বপর বর কন্যা আইল দুইজনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে॥

বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা-বর লৈল ঘরে॥
রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন॥
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা তাহাতে রহেন দুইজন॥

—কৃত্তিবাস

৩

হতাশের আক্ষেপ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু—
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥

নগর বসানু সাগর বান্ধিনু
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগী-করম-দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি
মরণ-অধিক শেল॥

—জ্ঞানদাস

৪

কালকেতুর বিক্রম

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন-সুখ-হেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
গুণ শীল রূপ বাড়া, বাড়ে যেন শাল-কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঠি,
করযুগে লোহার শিকলি।

বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥
কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা,
কাণে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ী, মাথায় জালের দড়ি,
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল ॥
লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে, পড়য়ে ধরণী 'পরে,
ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয় ॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু ধরে,
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥
গণক আনিয়া ঘরে, শুভ তিথি শুভ বারে,
ধনু দিল ব্যাধ সুত-করে।
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেঝা, ছাড়িতে শিখায় নেজা,
চামের টোপর দেয় শিরে ॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

৫

শিবের দক্ষালয় যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধ্বক্ধ্বক্ ধ্বক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে যক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।
ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

৬

স্বদেশী ভাষা

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা-জল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা ?

—রামনিধি গুপ্ত

৭

সর্ব্ববাদিসম্মত স্তোত্র

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
সর্ব্বদেশে পূজ্য তুমি সকল সময় ;
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয়—
কেহ বা যিহোবা, যোব, কেহ প্রভু কয়।

অনাদি-কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ ক'রে আচ্ছাদিত ;
এইমাত্র জানি আমি তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয়।

যদিও করেছ হেন অবস্থা আমার,
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার ;
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন,
তথাচ মানব-মন সদাই স্বাধীন।

ধর্ম্মেতে যে করে সাধু কর্ম্মের বিধান,
যে কর্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান,
সেই সাধু কর্ম্ম প্রতি মন যেন যায়,
কুকর্ম্মেতে ঘৃণা হোক নরকের প্রায়।

অপার কৃপার গুণে যা দিয়াছ প্রভু,
অসন্তোষ তাহাতে না হয় যেন কভু,—
তখন মানব রাখে ঈশ্বরের মান,
যখন সুখেতে ভুঞ্জে বিভুদত্ত দান।

ক্ষুদ্র এই ধরাধামে তোমার কুশল,
হেন যেন নাহি ভাবি রয়েছে কেবল ;
মানুষের শুধু তুমি—না করি বিচার,
যেহেতু সহস্র বিশ্ব চৌদিকে তোমার !

যেন এই বোধহীন অজ্ঞানের হাত
পাপী বোধে কারে নাহি করে দণ্ডাঘাত ;
অভিশাপে যেন নাহি মন্দ করি তার,
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার।

ন্যায়-পথে থাকি যদি, কর দয়া দান—
চিরকাল করি যা'তে সুখে অবস্থান ;
ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ।

তাহে যেন নাহি করি মিছা অহঙ্কার,
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ আমার।
আর অসন্তোষ যেন তাহাতে না হয়,
আমারে যা দাও নাই ওহে দয়াময় !

পর-দুঃখে দুঃখী হ'তে কর উপদেশ,
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ ;
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময় ! যেই দয়া চাই তব ঠাঁই।

নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব,
যেহেতু কৃপায় তব রয়েছি সজীব ;
আমারে চালাও, নাথ ! আপন অধীনে,
বাঁচি কিংবা মরি আমি অদ্যকার দিনে।

অদ্য যেন অন্ন আর শান্তি লাভ হয়,
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে রয়,—
দিতে হয় দাও, নয় কর নিবারণ,
ইচ্ছাময় ! ইচ্ছা তব হোক সম্পাদন।

সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন,
ধরা, সিন্ধু, শূন্য—তব পবিত্র আসন ;
করুক একত্রে এরা তব গুণ গান,
রাখুক সকলে মিলি তোমার সম্মান।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৮

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরির আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥

সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্ত্তন-যুগ

৯

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশী ! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আত্মবিলাপ *

(১)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায় !
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ?—এ কি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !

ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার।

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

(৫)

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায় !
কব তা কাহারে ?

সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন কামড়েরে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১১

মাতৃমঙ্গল

(১)

স্মরিয়া মায়ের মায়া,
পুলকে না পূরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয়, হেন যেই জন !—

তার কাছে না থাকিব,
তারে নাহি বিশ্বাসিব,
কবে মম কণ্ঠনালী করিবে ছেদন !
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে,
ঈশ-ভ্রূ কুঞ্চিয়া উঠে,
করে বজ্র টলে,—করে অনল বমন ;
জননীরে কটূ ভাষে,
উল্লাসি নরক হাসে—
কট্‌-কট্‌-রবে করে কপাট-পাটন ;
শাণ দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ ।

(২)

আর কি সে তনু আছে
ছিল যা মায়ের কাছে !—
কোথা ফুল্ল সে কপোল, সে ফুল্ল নয়ন !
কোথা নৃত্য হর্ষভরে,
কোথা করতালি করে,
কোথা সে চপল কায়, সপুলক মন !
কোথা খল-খল হাস,
কোথা কল-কল ভাষ,
সে সুষুপ্তি সুখময় নাহি পাই আর !
ভাবি-ভয় বিবর্জিত
কোথা যে অদীন চিত,

নিকুঞ্জে না দেখি আর ঘর দেবতার !—
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার !

(৩)

হে মাতঃ ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ !
তুমি পরশিলে করে,
জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান !
তুমি মুখে দিবে যাহা,
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ।
তব কাছে স্বর্গবাস,
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান।
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্ !

(৪)

ধরা হীরা হয়, হায় !—
সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় ;

ফুল হয় তারাদল,
চন্দন—সাগর জল,
শত-কল্প বসি যদি পূজি তব পায় ;
সুধাকর—সুধাগারে
পারি যদি আনিবারে,
সুনিত্য যদি সে সুধা করাই ভোজন
পারিজাত-দল দিয়া
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমার শয়ন ;—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন !

(৫)

তুমি মা ! না ধর দোষ,
তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায় !
শত অপরাধ করে,
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায় !
বাণী বর্ণিবারে চায়,
শেষ যদি সদা গায়,
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান !
হে সুর, অসুর, নর,
যেবা তনু বুদ্ধি ধর,

এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান—
বিশ্ব যার কর-গড়া কন্দুক সমান !

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১২

জীবন-সঙ্গীত

ব'লো না কাতর স্বরে   বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার,   তুমি কার, কে তোমার—
ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার,   এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন ;
কর যত্ন হবে জয়,   জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ   প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ,   করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায়, ক্ষণ যায়,   সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,—

সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর !
সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব !
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যাক যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয় ॥
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

কবির অন্ধ-দশা

বিভু ! কি দশা হবে আমার ?
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন !

সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী 'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন !
জীবনে বাসনা যত সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার
চির-অস্তমিত দিনমণি !
ধরা, শূন্য, স্থল, জল, অরণ্য, ভূমি, অচল,
না থাকিবে কিছুরি বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ?

প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ, হবে না কি, হে ভবেশ !
জানিব না, দিবা কারে বলে ?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোনো কালে !
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বদন।
নিজ কন্যা-পুত্র-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণমাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা !
কি নিয়ে থাকিব তবে, সিদ্ধ কি সাধনা হবে ?
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ;
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

পলাশির যুদ্ধ*

(১)

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি। ৪

(২)

অৰ্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

(৩)

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল
বন্দুক সদর্প ভরে
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

(৪)

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল—
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ-অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

(৫)

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মির-মদন পতন !

(৬)

"হুর্‌রে! হুর্‌রে!"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ।
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ ;
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ।

(৭)

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া এইক্ষণ!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল,—"নিকট শমন!

(৮)

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।

(৯)

"সেনাপতি! ছি ছি, এ কি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে, বল না, হায়
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ একধারে?

(১০)

“ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?

(১১)

“দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?

(১২)

“বীরপ্রসবিনী যত মোগল-রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে !
চঞ্চলা মোগল-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।

(১৩)

“কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয়-সমাজ ?
কেমনে দেখাবি মুখ ?
জীবনে কি আছে সুখ ?
স্ত্রী-পুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে !

(১৪)

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ !
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে !
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন !"

(১৫)

বাজিল তুমুল যুদ্ধ ; অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম-অগ্নি-উদ্‌গিরণ,
জলধর মধ্যে যেন অশনি-সম্পাত !

(১৬)

নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দ্দয়-হৃদয়,
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে ;
এইবার ইংরাজের হ'ল পরাজয় ।

(১৭)

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ !
কর অস্ত্র সম্বরণ !
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ ।"

(১৮)

উত্থিত কৃপাণ কর হইল অচল ;
সম্মুখে চরণদ্বয়
উত্থিত—তুরঙ্গচয়
দাঁড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

(১৯)

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ
নদী কোনমতে তারে
যদি বা টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

(২০)

তেমনি বারেক যদি টলে সৈন্যগণ,
ইংরাজ সঙ্গিন করে,
(ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে)
ছুটিল পশ্চাতে—যেন কৃতান্ত শমন।

(২১)

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়—
বরিষার ফোঁটা প্রায়
আঘাতে আঘাতে পড়ে নিমেষে ধরায়।

(২২)

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

—নবীনচন্দ্র সেন (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত)

১৫

পাছে লোকে কিছু বলে

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয় সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !
আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !
হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চলে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
একসাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

—কামিনী রায়

১৬

চাহিবে না ফিরে

পথে দেখে’ ঘৃণাভরে কত কেহ গেল সরে’,
উপহাস করি’ কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি’ বরষি’ গঞ্জনারাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়ে যায় শেষে ফেলে’।

পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, হু’টি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে’ অসহায়,— পদে তারে দলে’ যায়,
হু’খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও-শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চ’লে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেল আলো,—পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া ক’রে, তুলিবে না হাত ধ’রে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ?

তোমাদের বাক্ষি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

—কামিনী রায়

আধুনিক যুগ

১৭

সন্ধ্যা

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি' পড়ে কত প্রেম-বাণী !

নব-নীলোৎপল মত
আঁখি দুটি অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ !
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন !

নয়নে গভীর তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ সমুদ্র-দীপ্তি,
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম !
নিশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম !

আসে ধনী আথিবিথি,
কপালে তারকা-সিঁথি
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু—দিনান্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত-বাসনাঞ্চলে কত না রতন !

অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য !
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব,
দেবতা আশীষচ্ছলে বরষে শিশির।
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী !
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

১৮

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে!
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর,
আউসের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি' রে
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥
ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, ওগো দেখ্ দেখি—
মাঠে গেছে যারা তা'রা ফিরিছে কি?
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে!
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥

শোন শোন—ওই পারে যাব ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে!
পূবে-হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু'কূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি' জল
ছলছল উঠে বাজি রে,
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥

ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে,
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে!
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন—
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
ঊর্দ্ধে পাষাণ-তট, শ্যাম শিলাতল ;
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার ।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত-কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায় !
স্থির তারা নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে !

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে ।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা ।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে,
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন ;
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন ।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা ;

রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় ছু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' ছুই পাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি!

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি',
আবার সে পুঁথি 'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা"—চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে ছু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়!

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।

কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন

দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু ;
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।

"এখনো উঠাতে পারি," করযোড়ে যাচে—
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে!"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০
চাতক

সরিছে আঁধার কালো
উষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ-আধ ছবি ;
এত ভোরে, কোন্ পাখী !
গাহিছ আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি ?

মধুর কাকলী মুখে
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায়।
সুনীল গগনকোলে,
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে !
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায় !
কি জানি কি যোগ-বলে
স্বরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাও ;
দেবতার শিশুগুলি
খেলে যেথা হেলি দুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?

চিনেছি চিনেছি আমি
ওই যে চাতক তুমি,
প্রভাতা কিরণ মেখে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইছ জীব-ভাগে,
সুললিত গানে মরি মাতায়ে ভূতল !

শুনি ও অমৃত-গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃতধারা ঢালিছে ধরায় ;

ছুটিছে অমৃতরাশি,
অমৃত-হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত-তুফানে যেন মন ভেসে যায়।
হেন গান কোথা ছিল ?
কে তোমারে শিখাইল ?
কহ রে চাতক ! মোরে সেই সমুদয় ;
আমি ত বুঝেছি এই,
জগত-জননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত, আর কারো নয় !
যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী-ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;
যাঁহার কৌশলবলে
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এহেন গীতি সেই রে শিখায় !
অমন মধুরে পাখি !
তাঁরেই ডাকিছ নাকি
স্বরগ-দুয়ারে উঠি পরাণ খুলিয়া ?
তুমি রে ! ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে,
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া !

—মানকুমারী বসু

২১

বাসনা*

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে।

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব না'য়ে,

মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আতুল গায়ে ;
গাঙ্-চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী',
কদম-কেশর শিউরে উঠে'
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি' ;
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে'-ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়িয়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',
লাঙল দেব ভূঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাক্‌বে 'দেয়া',
আস্‌ব আমন রুয়ে'।

আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড় !
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে' !

২১

বাসনা*

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে।

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব না'য়ে,

মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ;
গাঙ্‌-চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী',
কদম-কেশর শিউরে উঠে'
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি' ;
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে'-ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়িয়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',
লাঙল দেব ছুঁয়ে,
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে 'দেয়া',
আস্‌ব আমন রুয়ে'।

আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড় !
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে' !

অবাক্ হ'য়ে দাওয়ায় বসে'
দেখ্‌বে তুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়
পাখীর সাঁতার-খেলা ;
কাঠ-ঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা' গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর—
পাখায় রঙের মেলা।

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি',
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই—
আলোর ছড়াছড়ি !

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার তুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,

ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর আগ-বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে’
সাঁজের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু’টি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি
‘ফণী-মনসা’র বেড়ায়-ঘেরা
‘দুর্গা-দীঘি’র ধারে।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে !
না ফুটিতেই উষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব ‘জয় জগদীশ’
প্রাণের ‘একতারা’তে।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

২২

চাষার ঘরে

প্রভাত হইতে ভদ্র-পাড়ায় ঘুরে' ঘুরে' সারা বেলা,
হজম করিয়া হরেক-রকম ভদ্র-আনার ঠেলা—
মুখোস-পরানো মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার,
গরিবের 'পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার,—
সন্ধ্যাবেলায় শূন্য জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে,
ওরে চাষা, তোর আগড়টা খোল্, ঠাঁই দে দাওয়ার ধারে।
তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব, ক'য়ে ছুটো সোজা কথা ;
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী-বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা।
না যদি বুঝিস্, তাও তো বুঝিব, রহিবে না কোন গোল,
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়া শুধু—ভদ্র-আনার ভোল !
থাক্ থাক্ ভাই, ব্যস্ত হোস্‌নে, কাঁথাতেই হবে বেশ,
খড়ের বুঁদীটা ওই তো রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্।
এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই ;
থাক্‌রে পাগ্‌লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্ দেখি কাছে, ভাই !
—খাবার জোগাড়—এখনি কি তার ?
হোক্ না খানিক রাত,
হ্যা হ্যা তাই হবে, তোর ঘরে খেলে যাবে নাকো আর জাত !

—দাঁড়িয়ে কেরে ও ? তোরি ছেলে নাকি ?
মদ্‌না না ওর নাম ?
তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে ! করে তো রে কাজ-কাম ?
ক্ষেতের কর্ম্মে ভারী দড় নাকি ! আহা ! ভারী খুসী শুনে'—
কি বল্লি ?—এই কুড়িতে পড়িবে সাম্‌নের ফাল্গুনে !
সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড়লোক যারা—খেতে বলে কেউ ? মিছে এত বড় হ'লি !
চা ও খানদুই বিস্‌কুট্ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র-আনার ঠাট্ !
বাজে কথা যাক্ ;—ক' বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন ?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন ?
মহাজন-দেনা রাজার খাজনা—হয়েছে তো সব শোধ ?
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে' বিবেচনা-বোধ !
ওরে ও মদ্‌না, একটা কল্‌কে তামাক পারিস্ দিতে ?
—দিয়েছিস নাকি ! এ যে দেখি তুই
বাপেরেও গেলি জিতে' !

ছাখ্, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলায় মাটি !
মাটির-ই যদি না এ-হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই ?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব-আগে বোঝা চাই ।

বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন্-ছুনিয়াটা,
মানুষ-ই তাঁহার মহা-মূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা ;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তার মুখে,—
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না ছুখে।
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের ছুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।
পায়ের তলার ধূলা—সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।
মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান ?
আত্মার সেই মহাছুর্গতি নহে দেবতার দান !
নাই ভগবান, নাইক ধর্ম্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানী ইস্কুলে !—
দূর করি' সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি' সেই ভেক্-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে',
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড়া ছুর্দ্দিনে।
ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি ছুপুর হ'ল বুঝি এইবার ;
খাটুনির দেহ, এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার।
সৌরভ যেন পাই বা কিসের—চিঁড়ে-কোটা বুঝি হয় !
ঢেঁকির শব্দ—তাই ত রে ঠিক ! সমস্ত বাড়ীময়
নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন—
আর কি চাইরে ? কোন আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন।

অতখানি দুধ !—কি হবেরে ভাই ? খানিকটা রাখ তুলে',
হজমই হয় না খাঁটি দুধ, সে যে বহুদিন গেছি ভুলে'।
এখো-গুড় নাকি ! বাড়ীতে হয়েছে ? তিন মণ দশ সের !
সবি ত বাড়ীর ! হায়, এ কি দান গরিব গৃহস্থের !

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

২৩

ছিন্ন-মুকুল

সব-চেয়ে যে ছোট পীঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে ;
ছোট থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে ;
বাড়ীর মধ্যে সব-চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব-আগে।

সব-চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,
খুসী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে !

ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি ;
ভয়-তরাসে ছিল যে সব-চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি !

চ'লে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে ;
যাবার বেলা টের পেল না কেহ,
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধ'রে।
চ'লে গেল,—পড়্‌তে চোখের পাতা,—
বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে বুঝি !
হারিয়ে গেল—অজানাদের ভীড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি' !

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে !
হারিয়ে গেছে বোল্‌-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি,
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলিফুলের রাশি ;
ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে,
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী।

সব-চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি,
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে ;
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজ্‌কে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে ।
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৪

ভক্তির যুক্তি

শুভ ফাল্গুনে দেখা হ'ল মোর
এক কৃষকের সাথে,
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল
হুঁকাটি লইয়া হাতে ।

দেখিয়া আমারে নোয়াইয়া মাথা
কহিল, ঠাকুর, শোনো—
তুমি পণ্ডিত, আমি ত মূর্খ,
জ্ঞান নাই মোর কোনো ।

পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে
একটা বিষয় নিয়ে
এই ছুনিয়ার মালিক যে জন—
পুরুষ বটে, কি মেয়ে ?

ধর্ম্মরাজের দেয়াসী মহেশ
বলিয়াছে জটা নাড়ি'—
ধরার কর্ত্তা জগদীশ্বর
হইতে পারে কি নারী ?

আমি ত' অবাক ! প্রসব করেছে
এই যে বিপুল ধরা
শ্যামা মা আমার, এ কথা জানে না—
মাথায় গোবর ভরা !

জগত-জননী মা না হ'ত যদি
দোপাটী পে'ত কি ফোঁটা ?
গোলাপ পে'ত কি রাঙা চেলী তার—
কদলী গরদ গোটা ?

শিখী কোথা পে'ত ময়ূরকণ্ঠী,
রেশমী পোষাক টিয়া ?
ঝুঁটি কোথা পে'ত ছোট বুলবুলি
—বাঁধা লাল-ফিতা দিয়া ?

ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে,
পারে সে সোহাগ নিতে—
টিপ্ কাজলেতে সাজাইতে পারে,
—দেখিনি ত' হেন পিতে !

সুমুখেতে দেখ দুষ্টু বোল্‌তা
সোনালী ঘুন্সী-পরা,
বকের কামিজ কিবা ইস্তিরি,
যায় না ময়লা করা !

ডোবার যে পানা—তাহারও পোষাক,
তাহাতেও ফুল-কাটা ;
ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই—
ওই যে খেজুর-কাঁটা !

ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে
দেখুক চাহিয়া কেহ—
চারিদিক দিয়া গড়ায়ে পড়িছে
মায়ের গভীর স্নেহ !

তুমিই, ঠাকুর, কর মীমাংসা—
বলিল সে হাসিমুখে ;
আমি তার সেই কর্কশ কর
টানিয়া নিলাম বুকে।

বলিলাম, জেনো—ধর্ম্মক্ষেত্র
এই সে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ
বুকের চণ্ডীপাঠ!

—কুমুদরঞ্জন মল্লি

২৫

আকিঞ্চন

দুঃখ যদি দিতে হয়   দাও তবে, দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ-গান,   উৎসবের কলতান
সারাদিন না পশে শ্রবণে।
যেথা নিত্য নাহি হেরি,   সতত আমারে ঘেরি'
উল্লাসের চল-নৃত্য চলে;
যেখানে সম্ভোগ-সুখ   গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখে
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে।
যেখানে ফোটে না ফুল,   সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
গাহে না এমন মধু-গান,
চাঁদের আদর পেয়ে   সোহাগে গিরির মেয়ে
নাচিয়া তুলে না কলতান।

সুখ যদি দিতে হয় দাও তবে, দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন
আর্ত্তনাদ হায়, পথে পথে !
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসের ধিক্কার না হানে ;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
আমাদের উৎসবের পানে।
হ'য়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লতিকারা
সেথা যেন ভূমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে,
ঋতুরাজ পাখা না গুটায়।

—কালিদাস রায়

২৬

বাঙ্‌লা মা

আমার শ্যাম্‌লা-বরণ বাঙ্‌লা-মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥

ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে
বৈরাগিণী বীণ্ বাজায় ॥

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে এক্‌লাটি
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি।
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণার সে বারি ছিটায় ॥

কাজ্‌লা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে ল'য়ে বাঘ ভালুক ;
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বে'দের সাথে সাপ নাচায় ॥

নদীর স্রোতে পাথর-নুড়ির কাঁকণ চুড়ি বাজ্‌ছে যে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টিপ্‌টি প'রে সন্ধ্যাতারার ;
উষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর-বেলায় ॥

হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে ;
ভাটীর স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

২৭

রূপাই

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙীন ফুল?
কাঁচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া;
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া!
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু;
গা'খানি তা'র শাঙন-মাসের যেমন তমাল-তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্।
কচি ধানের তুল্‌তে চারা হয়ত' কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তা'র হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়!
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তা'র?—
রঙ পেলে ভাই গড়্‌তে পারি রামধনুকের হার।

কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,—
কালো-বরণ যাঁর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে-কালো ত মাঠেরি ধান, যে-কালো তা'র গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখ্‌ড়াতে তা'র বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী'বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয়, ও 'পাগাল' লোহা যেন!
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।"

—জসীম উদ্দীন
